মন্দ মেয়ের উপাখ্যান ঃ নতুন জীবনের সন্ধানে ?

রজত রায়

শতাব্দীর সিকি ভাগ সময় পার হয়ে গেছে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ছবি করছেন। শু করেছিলেন সেই 'দুরত্ব' (১৯৭৮) দিয়ে, আজ এসে পৌঁছেছেন 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান'-এ (২০০৩)। এই দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতায় বুদ্ধদেববাবু কিছুটা বদলেছেন কি? মনে তো হয় না। ভদ্দরলোকের এক কথার মতো তাঁর চিন্তা ও মনন মোটামুটি একই স্তরে এসে স্থিতি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠিত একটি সাহিত্যকর্মকে ভিত্তি করে (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কমল কুমার মজুমদার, দিব্যেন্দু পালিত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ইত্যাদি), তার সঙ্গে সিনেমার নিজস্ব ভাষায় 'আপন মনের মাধুরী' মিশায়ে তিনি তৈরি করেন একেকটি ছবি যা তার নিজস্ব দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন তাঁর ছবি শুধু তাঁরই ছবি হয়ে ওঠে .... এটা খুব কম কৃতিত্বের কথা নয়।

প্রফুল্ল রায়ের গল্পটি গ্রামবাংলার পটভূমিতে একটি পতিতালয়কে কেন্দ্র করে। লোকলয় থেকে দুরে একটি পুরানো দোতলা বাড়িতে দশ বারো জন যৌন কর্মীর বাস। তাদের কারও কারও ছেলেমেয়েও থাকে তাদেরই সঙ্গে। গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি, সিনেমা হল এবং গাড়ির মালিক, ... বিকৃত লালসায় আচ্ছন্ন। তার লোলুপ দৃষ্টি একটি সপ্রতিভ যৌন কর্মীর (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) কিশোরী কন্যার উপর। কিশোরীটি স্কুলের লেখাপড়ায় ভাল, আরও পড়াশোনা করতে চায়, বিদ্যালয়ের এক প্রায়-প্রৌঢ় শিক্ষক তাকে বৃহত্তর পৃথিবীর আহ্বান শুনিয়েছেন, সে তাতে অনুপ্রাণিত। মায়ের পরিকল্পিত দেহ-ব্যবসায় সে কিছুতেই যোগ দিতে চায় না।

গাড়ির ড্রাইভারটি বিবেক-তাড়িত এক মধ্যবয়সী মানুষ (তাপস পাল)। তার চরিত্রের কিছুটা প্রতীকী তাৎপর্যও আছে। সে যে কেবলমাত্র যৌনকর্মীদের নিয়েই পারাপার করে তাই নয়, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায় নিঃস্ব এবং ক্ষুধার্ত একটি বৃদ্ধ দম্পতির জন্য সে একটি হাসপাতাল খুঁজে বেড়ায়, তার বিশ্বাস বিশ-তিরিশ মাইলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটি হাসপাতাল আছেই। কিন্তু দিনের পর দিন গাড়ি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েও সে কোনো হাসপাতাল খুঁজে পায় না। একটি গ্রামের কিছু ছেলেকে সে জিজ্ঞাসা করে, অসুখ হলে তোমরা কোথায় যাও? ছেলেগুলি সজোরে উত্তর দেয় .... 'শ্মশানে'।

বৃদ্ধ দম্পতিটির জন্য হাসপাতাল খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে একটি গাছতলার নীচে বসে লুডো খেলতে থাকে, বলে ঘরবাড়ির চাইতে গাছতলাই ভালো। দিগন্ত-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়ে গাড়িটি চলাচল করে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মাস্টার মশাই সাইকেল চালিয়ে চলে যান, বিড়ালটিকে দুরে ছেড়ে দিয়ে এলে সে ঠিক আবার ফিরে আসে .... এই সব সার সার চিত্রকল্প দর্শকের অনুভুতিকে নাড়া দিয়ে যায়। এইখানেই বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের গীতিকবিতার ছোঁওয়া।

মাস্টার মশাই বলেন, আর কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ চাঁদে যাবে। কিশোরী কন্যাটি বড় পৃথিবীর আহ্বান শুনতে পায়। অবশেষে সে একদিন কলকাতা-গামী মাস্টার মশায়ের চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ে। পরের শটেই দেখা যায় আমেরিকার মহাকাশ কেন্দ্র থেকে অতিকায় রকেট চাঁদের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। ছবিটির চিত্রকল্প-নির্মাণ অসাধারণ। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিকোণ এবং বেনুর ক্যামেরা যাদুর মতো কাজ করে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শুধুমাত্র একটি গাড়ির যাওয়া-আসা এবং কেবলমাত্র যৌন-কর্মীদের পারাপারই নয়, এক বৃদ্ধ দম্পতির আশ্রয়ের সন্ধান .... সব কিছুই যেন একটা মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুলতার চিত্রকল্পের পথ ধরে আসে।

বুদ্ধদেব কোনদিনই সাদাসিধে ন্যারেটিভ স্টাইলে গল্প বলেন না (যে জিনিসটা সাড়া জীবনটা সাড়া জীবন অত্যন্ত সচেতনভাবে করে এসেছেন সত্যজিৎ রায়)। গল্প বলতে গিয়ে তিনি ন্যারেটিভের ধারাবাহিকতা ভেঙে ফেলে কবিতার সুষমা নিয়ে আসেন, যা শিল্পের বিচারে রসোত্তীর্ণ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু গোটা ছবির সামগ্রিকতায় তাতে রসাভাস ঘটে, ফলে দর্শককে একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে দুরে সরে যেতে হয়। এই ভাবেই শিল্পের সঙ্গে দর্শকের ব্যবধান বাড়তে থাকে। ক্যামেরার চোখ দিয়ে যে ভিস্যুয়াল ইমেজ তিনি তৈরি করেন তার তাৎক্ষণিক নান্দনিক সৌন্দর্য দর্শককে মুগ্ধ করে দেয় ঠিকই, কিন্তু গল্পের মূল প্রবাহের সঙ্গে প্রায়শই তার কোন সংযোগ থাকে না। ফলে এই ছবিতে নতুন জীবনের সন্ধানে কয়েকটি মেয়ের অনিশ্চিত যাত্রা বাস্তবতা আর স্বপ্নের মাঝামাঝি পথ ধরে আসে, বোঝা যায় না ওটা কি বাস্তব, নাকি পরিচালকের ইচ্ছাপুরণের কাহিনী? ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না ....

ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা।

'মন্দ মেয়ে'দের জীবনযাত্রার একপেশে রূপ কিছুটা দেখলাম, কিন্তু বাস্তবের অপর পিঠটা দর্শকের পুরোপুরি চোখের আড়ালেই রেখে দেওয়া হল আমরা বিত্রেতা দেখলাম, ত্রেতাদের তো দেখলাম না। এটা কি বাস্তব-সম্মত হল? ছবিটি কি অর্ধেক বাস্তব, আর অর্ধেক প্রতীকী? 'মন্দ মেয়ে'দের যদি বা দেখলাম তাহলে 'ভাল ছেলে'র দলবল, অর্থাৎ তাদের ত্রেতা বা খরিদ্দারেরা কোথায় গেল? বাস্তবত ার এই অসম্পূর্ণতার জন্যই যৌন কর্মীদের শক্তিশালী সংগঠন 'দুর্বার' এমন অপমানিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নিন্দুকের এই অভিযে াগের উত্তরে বুদ্ধদেব বলতে পারেন কোনো সমাজ-সংস্কারকের দায় নিয়ে তিনি ছবি করতে বসেন নি, অপমানিত মনুষ্যত্বকে নিয়ে ব্যক্তিগত শিল্প সৃষ্টি করেছেন। সেই শিল্প যদি মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে, তাহলে ভালই, না হলেও তাঁর করবার কিছু নেই। শত সহস্র পদদলিত মনুষ্যত্ব অন্ধকারের জগতে পড়ে আছে .... একক ভাবে তাঁর করার কিছুই নেই, শিল্পী তাঁর 'শিল্প' দিয়ে জটিল ও প্রাচীন সামাজিক সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেন না। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমস্যার সত্যনিষ্ঠ একটা চেহারা তুলে ধরতে পারেন। সেটা কি করা হয়েছে এই ছবিতে? না, তা হয়নি, কেবল ঝাপসাভাবে পটভূমিটিকে একটু ছুঁয়ে যাওয়া যাওয়া হয়েছে, কারণ তাঁর মতে, 'জার্নিটাই আসল' (আ. বা. প./৯.৮.২০০৩)।

'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান' সার্থক শিল্প না হয়ে, হয়ে উঠল শিল্পের ভণিতা। এইখানেই প্র এসে যায় বুদ্ধদেবের সততার। তিনি কেন ছবি করেন? কাদের জন্য ছবি করেন? তিনি কি প্রধানত তাঁর স্বদেশবাসী বাঙালী দর্শকের কথা মনে রেখেই ছবি করেন, ঠিক যে কাজটি করতেন সত্যজিৎ রায়? আমাদের দুর্ভাগ্য, বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে এর উত্তরটি হবে পুরোপুরি নেতিবাচক। তিনি ছবি করেন ফেস্টিভ্যালের জন্য, আর অ্যাওয়ার্ডের জন্য। সাধারণ বাঙালি চলচ্চিত্র-দর্শকের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ নেই, আর তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথ াব্যাথাও নেই। 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান' ও একটি আদ্যন্ত ফেস্টিভ্যাল-মার্কা ছবি, আর এর প্রযোজনাও করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া-নিবাসী জনৈক বামেরিকান। একেবারে যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে। ভালই হয়েছে। একেবারে সঠিক সংযোগই হয়েছে। কেবলমাত্র এর বাইরে রয়ে গেল সাধারণ বাঙালি চলচ্চিত্র-দর্শক, যাদের শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ কোনদিন বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের নামও শোনেননি, ছবিও দেখেননি। তাঁদের জন্য রয়ে গেল স্বপন সাহা, অঞ্জন চৌধুরী, হরনাথ চক্রবর্তীর দলবল।

সার্থক শিল্প, অথচ জনপ্রিয় বাংলা ছবিও তো আমরা বেশ কিছু দেখেছি। সত্যজিৎ রায় থেকে শু করে গৌতম ঘোষ পর্যন্ত অনেকগুলি শিল্পসমৃদ্ধ বাংলা ছবি যথেষ্ট দর্শককে তৃপ্তি দিয়েছে। কাজেই 'জনপ্রিয়' এবং 'শিল্পসম্মত' শব্দ দুটো কোনও পরস্পর-বিরোধী কথা নয়। সত্যজিৎ রায় একদা তপন সিংহকে জানিয়েছিলেন 'ভাল ছবি করতে হলে আগে দর্শককে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।' আর সেই কাজট া করতে গেলে যতটা শ্রদ্ধা, মমতা আর সহানুভুতি দিয়ে দর্শককে বুঝতে হয়, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েও, তাকে ওপরে তুলে আন ার চেষ্টায় নাছোড় থাকতে হয়। সেই ধৈর্য, মমতা আর একাত্মতা, দুঃখের বিষয় বুদ্ধদেবের নেই।

আমরা জানি mediocre শব্দটিতে বুদ্ধদেবের তীব্র অনীহা। আমরা তাঁকে mediocre হতে বলছি না কোনোমতেই। শুধু বলছি অ ার একটু tactful হতে। তাতে কোনো শিল্পীর জাত যায় না, বরং বাস্তব বিবেচনা শক্তির প্রকাশ পায়। 'mediocre' বুদ্ধদেবকে হতে হবে না, কিন্তু 'hypocrite' শব্দটি যে সত্যি সত্যিই অত্যন্ত নিন্দনীয় সেই কথাটা তাঁকে মনে রাখতে অনুরোধ করি।